

শ্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম

একদিনে সর্বোচ্চ সরবরাহ ৪৩৭ ইউনিট

কোয়ান্টাম ল্যাব থেকে ২০ অক্টোবর সরবরাহ করা হয়েছে ৪৩৭ ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান। এ পর্যন্ত যা একদিনের সর্বোচ্চ সরবরাহ। এর আগে একদিনের সর্বোচ্চ সরবরাহ ছিল ৪০৯ ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান (২৩ ডিসেম্বর ২০১৪)।

কোয়ান্টাম শ্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের সর্বস্তরের কর্মী ও দায়িত্বশীলদের অভিনন্দন জানিয়ে গুরুজী বলেন, ‘এটি নিঃসন্দেহে পরম করুণাময়ের অশেষ করুণা। আর এ কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মী এবং সেইসাথে কোয়ান্টাম পরিবারের সবার অক্লান্ত পরিশ্রম ও পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ কর্মপ্রয়াসের ফলেই সম্ভব হয়েছে এ অর্জন।

সেইসাথে রক্তদাতারাও এতে ভূমিকা রেখেছেন সমানভাবে। তারা নিজেরা নিয়মিত রক্তদানের পাশাপাশি পরিচিত আত্মীয় বন্ধু সবাইকে উদ্বুদ্ধ করেছেন কোয়ান্টাম ল্যাবে এসে রক্তদানের জন্যে।’

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে সারা বছরে কোয়ান্টাম ল্যাব সরবরাহ করেছে ৯৭,০১৯ ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান। এবছর আরো বেশি সংখ্যক মূর্খের জীবন বাঁচানোর লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে কোয়ান্টাম ল্যাব।

চারপাশের মানুষকে রক্তদানে অগ্রহী ও সচেতন করে তুলতে বিতরণ করা হচ্ছে বিশেষ ব্রোশিওর। সারা বছর দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা নিরাপদ রক্তের সেবাকে নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে আয়োজন করা হচ্ছে ব্লাড ক্যাম্প।

প্রো-মাস্টার্স ওয়ার্কশপ

শ্রদ্ধেয় গুরুজীর পরিচালনায় দুটি ব্যাচে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে প্রো-মাস্টার্স ওয়ার্কশপ। ২০ ও ২১ নভেম্বর (শুক্র ও শনিবার) অনুষ্ঠেয় ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করতে পারবেন ২০ তম রিয়েলাইজেশন প্রোগ্রামের প্রো-মাস্টাররা। পরবর্তী ২৭ ও ২৮ নভেম্বর (শুক্র ও শনিবার) অনুষ্ঠেয় ওয়ার্কশপে অংশ নিতে পারবেন পায়োনিয়ার থেকে ১৯ তম ব্যাচের প্রো-মাস্টাররা।

স্থান : ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইডিইবি) কাকরাইল, ঢাকা।

আসন সীমিত। দ্রুত কার্ড সংগ্রহ করুন।



কোয়ান্টাম বুলেটিন

নভেম্বর ২০১৫

রাজধানী আদর্শ বিদ্যাপীঠ

সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের দায়িত্ব নিল কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন



সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয় ঢাকার যাত্রাবাড়ীস্থ ‘রাজধানী আদর্শ বিদ্যাপীঠ’। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের সন্তানরাই এ স্কুলের শিক্ষার্থী। সম্প্রতি স্কুলটির দায়িত্ব নিয়েছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। বর্তমানে এ স্কুলের শিক্ষার্থী সংখ্যা ১৮৮ জন।

ঢাকা শহরের পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা মূলত ভারতের তেলুগু-কানপুরী ভাষাভাষীদেরই উত্তরসূরি। বংশপরম্পরায় যারা এ শহরের আবর্জনা সাফ করার কাজ করে যাচ্ছে। যুগ যুগ ধরে অবহেলা বঞ্চনা দারিদ্র্য আর অবমাননার কষাঘাতে তারা বন্দি হয়ে পড়েছে মনোজাগতিক দাসত্বের আত্মবিশ্বাসী বৃত্তে। শৈশব থেকেই ওরা বিশ্বাস করতে শুরু করে-তাকেও একদিন বাবার সাথে ছুটে হবে পুঁতিগন্ধময় আবর্জনা সাফ করতে। কারণ, তার সামনে এমন কেউ থাকে না যাকে দেখে সে পায় বৃত্ত ভাঙার সাহস। উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হতে পারে বড় কিছু করতে। পরিবার ও পারিপার্শ্বিক চাপে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে বাধ্য হয় অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করে পরিচ্ছন্নতাকর্মীর চাকরি যোগাড় করতে।

এই ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যেই ১৯৮২ সালে ‘রাজধানী আদর্শ বিদ্যাপীঠ’ স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার একমাত্র সম্মল এ স্কুলটিও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে গত বছর বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল।

এ অবস্থায় স্কুল পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে যোগাযোগ ও উৎসাহের প্রেক্ষিতে এখন থেকে এ স্কুলের শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষা, পড়াশোনা-সংক্রান্ত সব ধরনের ব্যয় ও শিক্ষকদের বেতন-ভাতাসহ সার্বিক পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবে ফাউন্ডেশন।

এ বছরের আগস্ট মাসে স্কুল পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে সভাপতি প্রদীপ চন্দ্র দাস, সহ-সভাপতি সংকর দাস নাইডু ও প্রধান শিক্ষিকা মাহমুদা খানম কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের পরিচালক সমন্বয় মিসেস সুরাইয়া রহমানের কাছে স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব হস্তান্তর করেন।

উল্লেখ্য, বান্দরবানের লামায় ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজে পড়াশোনা করছে আট শতাধিক শিশু-কিশোর।

১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ নভেম্বর

চার মাস পর ঢাকায় কোয়ান্টাম মেথড কোর্স ৩৯৭ ব্যাচ

চার মাস পর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স। ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩৯৭ তম ব্যাচ। আধুনিক তথ্য-উপাত্ত-গবেষণার আলোকে জীবনযাপনের বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করার এ এক অনন্য সুযোগ।

দীর্ঘ ২৩ বছরে কোয়ান্টাম মেডিটেশনের সাথে একাত্ম হয়েছেন নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ। লাভ করেছেন সঠিক ও ইতিবাচক জীবনদৃষ্টি, আলোকিত জীবনের চিরায়ত দর্শন ও সাফল্যসূত্র। রোগকে পরিণত করেছেন সুস্থতায়, ব্যর্থতাকে সাফল্যে আর অশান্তিকে প্রশান্তিতে। বদলে গেছে লাখো জীবন।

উল্লেখ্য, এবছর ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ জুন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় ৩৯৬ তম ব্যাচ। পরবর্তী চার মাসে ফাউন্ডেশনে আত্ম উন্নয়নমূলক নানা ধরনের প্রোগ্রাম, ওরিয়েন্টেশন, ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হলেও ঢাকা বা ঢাকার বাইরে কোনো কোর্স অনুষ্ঠিত হয় নি। তাই আসন্ন কোর্সকে ঘিরে নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনায় সক্রিয় হয়ে উঠেছেন ফাউন্ডেশনের সদস্যরা।

৩৯৭ তম ব্যাচকে কেন্দ্র করে কোয়ান্টাম পরিবারের গ্রাজুয়েট, প্রো-মাস্টার, কোয়ান্টিয়ার, আর্ডেন্সিয়াররা নিয়মিত সংযোগায়ন করছেন তাদের পরিচিত, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী ও প্রতিবেশীদের সাথে।

চারপাশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছেন জীবন বদলের আলোকিত অভিযাত্রায় অংশ নিতে। সেইসাথে বিভিন্ন অফিস, মার্কেট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আয়োজন করছেন কোয়ান্টাম সভা ও বৈঠক। বিতরণ করছেন কোর্স কার্ড, বুলেটিন ও অন্যান্য প্রকাশনা।

এর পাশাপাশি ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন সেন্টার, শাখা, সেল, প্রি-সেলগুলোও উদ্যোগ নিয়েছে নানা ধরনের উদ্বুদ্ধায়ন কার্যক্রমের। সবমিলিয়ে কোয়ান্টাম মেথডের সাফল্যযাত্রায় ঘটে যাচ্ছে নিরাময় ও সাফল্যের আরেকটি মাইলফলক।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স

৩৯৮ তম ব্যাচ ১১ ঢাকা

১৮, ১৯, ২০ ও ২১ ডিসেম্বর
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

স্থান : ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইডিইবি) কাকরাইল, ঢাকা

অধ্যাপক ডা. আবদ হোসেন মোল্লা। দেশের বিশিষ্ট শিশু-চিকিৎসক ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিওন্যাটোলজি বিভাগের প্রধান। সম্প্রতি (২৩ জুলাই) মাগুরায় একটি রাজনৈতিক সহিংসতায় গুলিবিদ্ধ হন একজন মহিলা ও তার গর্ভস্থ শিশু। দেশজুড়ে আলোচিত এ শিশুটির চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তিনি। জন্মের দুদিন পর সংকটাপন্ন অবস্থায় শিশুটিকে ঢা.মে.ক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ১০ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন অধ্যাপক আবদ। উল্লেখ্য, তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩২৮ ব্যাচে অংশ নেন। গত ১৫ সেপ্টেম্বর এ বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি তিনি তুলে ধরেন সাপ্তাহিক আলোকায়ন কার্যক্রমের একটি বিশেষ সেশনে।

আত্মিক সুখের জন্যে অন্যের কল্যাণে কাজ করতে হবে

অধ্যাপক ডা. আবদ হোসেন মোল্লা

২৩ জুলাই মাগুরা সদর হাসপাতালে জরুরি অপারেশনের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় মাতৃগর্ভে গুলিবিদ্ধ এ শিশুটি। মাতৃগর্ভে ৪০ সপ্তাহ (ন্যূনতম ৩৭ সপ্তাহ) সময়কাল পার করলে আমরা তাকে ফুল-টার্ম বেবি বলে থাকি। কিন্তু এ শিশুটির গর্ভকালীন বয়স ছিল ৩২ সপ্তাহ। অর্থাৎ প্রি-ম্যাচিউর বেবি। স্বাভাবিকভাবেই তাই নানান জটিলতা দেখা দিয়েছিল। এছাড়াও গুলির জখম তো আছেই!

স্থানীয়ভাবে চিকিৎসকরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করলেন শিশুটিকে বাঁচাতে, দুদিন বাদে পাঠিয়ে দিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। আমাদের নিওন্যাটোলজি ইউনিটে ওকে ভর্তি করা হলো। গুলির ক্ষত সারাতে মোট ২১টি সেলাই পড়ল ওর ছোট শরীরে।

এ ধকল সামলে ওঠার আগেই মারাত্মক জন্মসি দেখা দিল শিশুটির।

শরীরে পানি জমে গেছে, যেখানে হাত দেই দেবে যাচ্ছিল। এছাড়াও রক্তের প্লাটিলেট কমে যাচ্ছে, উপরন্তু হার্টে একটি ছিদ্র ধরা পড়ল এবং সেইসাথে অস্বাভাবিক হৃৎস্পন্দন। সবমিলিয়ে অবস্থা রীতিমতো সংকটাপন্ন। সাথে যুক্ত হয়েছে নানারকম চাপ-গণমাধ্যমের চাপ, মানুষের প্রত্যাশার চাপ ইত্যাদি।

অবশ্য এ সময়টাতে সবাই খুব সহযোগিতা করেছেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক ও নার্সরা তো ছিলেনই, সাথে অন্যান্য হাসপাতালের বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরাও আমাদের পাশে ছিলেন তাদের সাধ্যমতো।

সময়টা ছিল ভীষণ কঠিন। একে তো অপরিণত শিশু, ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে অর্ধেক, তার ওপর একটার পর একটা সমস্যা প্রতিদিন দেখা দিচ্ছিল। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম। একদিন কোয়ান্টামের একজন অর্গানায়ারকে ফোনে বললাম, ‘গুরুজীকে বিষয়টা জানিও, দোয়া করতে বোলো।’ সে বলল, ‘স্যার, আমি জানাব গুরুজীকে। আর আপনি যেহেতু বাচ্চাটার দায়িত্ব নিয়েছেন, আপনি একটু বেশি করে দোয়া করবেন।’

এর মধ্যেই একদিন অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে গেল। রাতে বাসায়ে গিয়েও দুশ্চিন্তায় ছটফট করছি। আমার স্ত্রী বললেন, ‘কী হয়েছে?’ কিছুটা হতাশার সুরেই বললাম, ‘বাচ্চাটার অবস্থা বিশেষ ভালো না, সকালে হাসপাতালে গিয়ে কী শুনতে হয় জানি না।’ উনি বললেন, ‘তুমি নামাজ পড়ো।’

নামাজ পড়ে গভীর আকুতি নিয়ে দোয়া করলাম। মনে হলো, আমরা আমাদের সর্বাঙ্গিক চেষ্টা করে যাচ্ছি, এখন সিদ্ধান্ত তাঁর হাতে। একটা শান্তি অনুভব করলাম দোয়ার পর। এমন একটি অনুভূতি হলো যেন আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করেছেন!

আল্লাহর অশেষ রহমত, পরদিন থেকেই অবস্থার উন্নতি হতে শুরু করল।

সংকট কেটে গেল একসময়। অবশেষে ২০ আগস্ট আমরা শিশুটিকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিতে পেরেছি। এটি আমাদের জন্যে আল্লাহর तरফ থেকে বিশেষ সাহায্য। এজন্যে সবসময় তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

এ ঘটনাটি আমাকে এক অন্যরকম উপলব্ধিতে সিক্ত করেছে। কারো জন্যে আন্তরিকভাবে কিছু করা এবং মানুষকে দেয়ার মধ্য দিয়েই আমরা আসলে সত্যিকার সুখ ও আত্মিক পরিতৃপ্তি লাভ করি, যা অর্থবিশ্ব প্রশংসা যশ হাততালি কখনোই দিতে পারে না। আর এগুলো বেশি হলে বরং মানুষ বেহিসাবি হয়ে পড়ে। স্থলন ঘটে নানাভাবে।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারের একটা লেখা পড়েছিলাম। তিনি বলেছেন— ‘আমাদের দুই টাকা হলে আমরা চার টাকা চাই, চার টাকা পেলে আট টাকা, আট টাকা পেলে ১৬ টাকা ...। এভাবে আমাদের চাওয়াটা ক্রমান্বয়ে বাড়তেই থাকে। কোথায় এর শেষ আমরা নিজেরাই জানি না। আর এ নিদ্রাহীন চাওয়ার মধ্যেই অধিকাংশ মানুষের জীবন শেষ হয়ে যায়। সুখ আর মেলে না।

সুখী হওয়ার জন্যে তাই তিনি বলেছেন, তোমরা প্রত্যাখ্যান করতে শেখো। অর্থাৎ আমার বেঁচে থাকার জন্যে এর বেশি আর দরকার নেই। বেশি যা আছে সেটা দিয়ে দাও।’

কথাটা আমি নিজেও গভীরভাবে বিশ্বাস করি। এই যে কোয়ান্টামের উদ্যোগে এত ছেলেমেয়ে লামায় পড়াশোনা করছে, এ কাজটা তো গুরুজী ঢাকায়ও করতে পারতেন। কিন্তু করেন নি, কারণ তিনি প্রচার চান নি। দুর্গম পাহাড়ে যারা শিক্ষা ও ন্যূনতম সুযোগসুবিধা বঞ্চিত—তিনি চেয়েছেন তাদের জন্যে কাজ করতে। ওদের সন্তানদের গড়ে তুলতে। তিনি চেয়েছেন আত্মার সুখ—নিজের জন্যে, কোয়ান্টাম পরিবারের সবার জন্যে।

আত্মার এ সুখটা পায় বলেই একজন মানুষ পরার্থে কাজ করে, দিয়ে দিতে পারে তার প্রয়োজনের

অতিরিক্ত সবটুকু। আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান স্যার তার পেনশনের পুরো অর্থই জনকল্যাণে ব্যয় করেছেন। হাসপাতাল নির্মাণ করেছেন তার জন্মস্থান সাতক্ষীরাতে। একদিন গেলাম তার কাছে।

স্যারকে বললাম, পরম করুণাময়ের ইচ্ছায় পেশাগত ও বৈষয়িক অনেক অর্জন আছে আমার জীবনে। এ সবকিছুই আমাকে বাহ্যিক সুখ দেয় সত্যি, কিন্তু একটা অন্তর্জ্বালা প্রায়ই ভেতরে কাজ করে—মানুষকে আসলে আমি কতটুকু দিতে পেরেছি?

স্যার বললেন, যে মাটিতে তুমি বেড়ে উঠেছ সে মাটির ঋণ শোধ করো। তোমার আয়ের শতকরা ২.৫ ভাগ যাকাত তো দিচ্ছ। আরো ২.৫ ভাগ সেবামূলক কাজে দান করো। আর প্রতি মাসে তোমার মোট কর্মঘণ্টার শতকরা ২.৫ ভাগ সময় ওখানে সেবামূলক কাজে ব্যয় করো।

স্যারের কথামতো আমি এটি অনুসরণ করছি এবং যশোরে নিজ গ্রামে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছি। আসলে সুস্থ সুন্দরভাবে সমাজে বাস করতে চাইলে এ-কাজগুলো আমাদের সবাইকেই করতে হবে। কারণ, একা ভালো থাকা যায় না। সম্ভবও নয়।

ধরা যাক, আপনি ভালো ড্রাইভ করেন, কিন্তু ওপাশ থেকে যে আসছে সে যদি ভালো ড্রাইভার না হয় তাহলে তো দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকেই যায়। তাই তাকেও প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও দক্ষতায় যোগ্য করে তুলতে হবে।

আর এজন্যে নিজেদের চাওয়া-পাওয়ার গণ্ডি ছেড়ে বাইরে আসতে হবে আমাদের। দাঁড়াতে হবে মানুষের পাশে। মানুষের প্রয়োজনের পাশে। এভাবে অন্যের কল্যাণে কাজ করার মধ্য দিয়েই মিলতে পারে আমাদের আত্মিক সুখ ও সত্যিকার পরিতৃপ্তি।

অনুলিখন : ডা. আতাউর রহমান

গুরুজীকে লেখা চিঠি

শ্রদ্ধেয় গুরুজী,

আসসালামু আলাইকুম।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করে আমি পেশাগত অনেক সফলতা অর্জন করি। বুয়েট থেকে পাস করে ভালো চাকরি করছিলাম। কিন্তু আত্মিক শান্তি পাচ্ছিলাম না। কারণ আমার স্বপ্ন যে আরো বিস্তৃত। আমার স্বপ্ন এমন কিছু করার, যা আমাকে নিয়ে যাবে লাখো মানুষের কাছে। কিন্তু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ঠিক করতে না পেরে প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ভুগছিলাম।

তখন আমার মায়ের পরামর্শে লামা কোয়ান্টায়নে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। উদ্দেশ্য হলো আমার ভেতরের আমিকে খুঁজব, বুঝতে চেষ্টা করব আসলে আমি কী চাই। আজ থেকে ১০/২০/৩০ বছর পর আমি নিজেকে কোথায় দেখতে চাই।

কোয়ান্টায়নে গিয়ে (নভেম্বর ২০১৪) মনে হলো, আমি নিজেকে কিছুটা বুঝলাম। অনুতাপ অনুশোচনা আর ভালো কিছু করার তীব্র আকাঙ্ক্ষার অশ্রু মিশে একাকার হলো। কোয়ান্টায়ন থেকে ফিরে পুরো পৃথিবীটা আমার কাছে নতুন লাগছিল।

লামা কোয়ান্টায়নে আমি দুটো সূত্র পেলাম। প্রথমত, সফল না হওয়া পর্যন্ত আমি চেষ্টা করে যাব। কেউ আমাকে থামাতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, আমি আর কোনোদিন হতাশ হবো না। হতাশা শব্দটি আমার জীবন থেকে বিদায় নিয়েছে। শূন্য-কে কীভাবে পূর্ণ করতে হয় তা এখন আমি জানি। ফলাফল দেয়ার মালিক একমাত্র স্রষ্টা। আমি শুধু আমার কাজ করে যাব। আমি তখন যেন এক অন্য মানুষ-দৃঢ়, আত্মপ্রত্যয়ী ও আশাবাদী।

চাকায় ফিরে ই-মেইল চেক করে দেখি আমার যোগাযোগের ভিত্তিতে জার্মানির একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একজন প্রফেসর ই-মেইল করেছেন। তিনি এক সপ্তাহের মধ্যে আমার ইন্টারভিউ নিতে চান। সেদিনই বুয়েটে ছুটলাম সার্টিফিকেট ও রিক্রুটমেন্ট লেটার যোগাড় করতে। ইতিপূর্বে কোনো প্রফেসরকে আমি এ ব্যাপারে রাজি করতে পারি নি। অথচ সেদিন কাকতালীয়ভাবে চার জন প্রফেসর আমাকে তৎক্ষণাৎ সুপারিশ করলেন!

এর পরের গল্পটা শুধু সামনে এগিয়ে যওয়ার। ইন্টারভিউ-এর দিন জার্মান প্রফেসর এত খুশি হলেন যে, সাথে সাথে আমার এডমিশন কনফার্ম করলেন। মাত্র তিন মাসে জার্মানির ভিসা পেয়ে গেলাম। শুধু তা-ই নয়, প্রফেসর নিজে আমার জন্যে স্টুডেন্ট ডরমিটারিতে সুপারিশ করলেন।

এ বছর মার্চের ১০ তারিখে আমি মিউনিখে পা রাখি। ওখানে পৌঁছে আমার প্রথম চিন্তা ছিল কীভাবে মাটির ব্যাংক বানাব। ছোটবেলা থেকেই আমার মা আমাদের দুই ভাইবোনকে দানে উদ্বুদ্ধ করতেন। দেশে প্রতিদিন অফিসে যাবার আগে মাটির ব্যাংকে টাকা রাখতাম। মাসের বেতনের একটি নির্দিষ্ট অংশ মাটির ব্যাংকে দান করতাম। জার্মানিতে এসে হাড়ি-পাতিল কেনার আগে তাই একটা সুন্দর কাচের বয়াম জোগাড় করি। প্রথম ইউরো রাখি আমি আমার মাটির ব্যাংকে। প্রচণ্ড আনন্দ হয় মনে-আল্লাহ আমাকে অশেষ সৌভাগ্য দান করেছেন!

মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়ার পাশাপাশি স্টুডেন্ট জব খুঁজতে শুরু করি। কারণ বাবা-মায়ের জন্যে খুব কষ্ট হতো। আমার বাবা বড় অঙ্কের টাকা ব্যয় করেছেন আমাকে জার্মানি পাঠানোর জন্যে। তাই কারো কথায় কান না দিয়ে নিজের প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি দিয়ে নতুন কিছু পদক্ষেপ নিই। আশ্চর্যজনকভাবে জার্মানির বড় বড় কোম্পানি থেকে ইন্টারভিউ-এর ডাক পেতে থাকি। আমার আত্মবিশ্বাস এতে আরো বেড়ে যায়। কিছু জায়গা থেকে প্রত্যাখ্যাতও হয়েছি। কিন্তু আমি থেমে যাই নি। প্রতিকূলতার মাঝে লেখাপড়া ও চাকরির আবেদন চালিয়ে গেছি।

লামার শিশুদের কথা আমার সবসময় মনে পড়ে। পরিশ্রম করার স্পৃহা আরো বেড়ে যায় যখন ভাবি, নতুন বাচ্চাদের জন্যে একটা ভালো বিস্তিৎ দরকার। একদিন আল্লাহকে বললাম, আমি লামার শিশুদের জন্যে কিছু করতে চাই। ওদের জন্যে যা প্রয়োজন তা-ই আমার বেতন নির্ধারিত হোক। আমি প্রথম মাসের বেতন লামার শিশুদের জন্যে দিতে চাই। এর পর কিছু মজার ঘটনা ঘটতে শুরু করে।

বিশ্বখ্যাত প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ইন্টেল থেকে

ইন্টারভিউ কল পাই।

সেদিনই ইন্টেল

রিসার্চ এন্ড

ডেভেলপমেন্ট

ডিপার্টমেন্টে আমি

রিসার্চ স্টুডেন্ট

হিসেবে কাজ করার

সুযোগ পাই। এক

বছরের কন্ট্রাক্ট দেয়া

হয়। জার্মানিতে

প্রথমেই এক বছরের

কন্ট্রাক্ট পাওয়া খুবই দুর্লভ ব্যাপার। কিন্তু আল্লাহ

আমার স্বপ্ন পূরণ করলেন-পৃথিবীর অন্যতম দক্ষ

গবেষক দলের সাথে কাজ করার সুযোগ পেলাম।

১ আগস্ট ইন্টেল-এ যোগদান করি। তার

আগের দিন সকালে ৩১ জুলাই আমাদের প্রথম

সেমিস্টারের রেজাল্ট প্রকাশিত হলো। মেধা

তালিকায় স্থান পেয়ে আমি সবার নজর কাড়তে

সক্ষম হলাম। দুইটা বিষয়ে আমি ১০০% মার্কস

পেয়েছি! ক্লাসে যারা বাংলাদেশকে চিনত না, তারা

বাংলাদেশকে চিনল।

গুরুজী, ইনশাল্লাহ আমি আমার প্রথম মাসের

বেতন ফাউন্ডেশনে পাঠাব। এই টাকা যদি লামার

শিশুদের কোনো কাজে লাগে আমি খুব খুশি হবো।

আমি এখনো সাধারণ একজন শিক্ষার্থী। আমার

বাবা-মাকে একটিবার হলেও ছবির মতো সুন্দর এই

জার্মানি ঘুরিয়ে দেখাতে চাই। এজন্যে অল্প অল্প করে

অর্থ সংগ্রহ করছি। দোয়া করবেন যেন আমার এ

আশাটা পূরণ হয়।

গুরুজী, আমি মনোযোগ দিয়ে আমার পড়ালেখা

এবং কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। দোয়া করবেন স্রষ্টা যেন

আমার সহায় হন এবং কাজ দিয়ে, সাফল্য দিয়ে

আমি যেন আমার দেশকে সুপরিচিত করতে পারি।

—সানজিদা আফরিন

মাস্টার্স স্টুডেন্ট, ইউনিভার্সিটি অব অ্যাপ্লাইড সায়েন্স,

রোজেনহেইম, জার্মানি

৩৭২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট



শ্রদ্ধেয় গুরুজী,

আসসালামু আলাইকুম। আশা করি ভালো আছেন। আমিও বেশ ভালো আছি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে অশেষ শুকরিয়া প্রকাশ করছি। কারণ তিনি আপনার মাধ্যমে আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। ফলে আমরা জ্ঞান অর্জনের পথে যাত্রা করার সুযোগ পেয়েছি এবং জীবনের ভুলভ্রান্তিগুলো ক্রমাগত চিহ্নিত করার মাধ্যমে আলোকিত হচ্ছি।

যত ব্যস্ততাই থাকুক কোরআনের মর্মবাণী আমি নিয়মিত পড়ি। মাস খানেক আগে মর্মবাণী পড়তে গিয়ে হঠাৎ দেনমোহর-সংক্রান্ত আয়াতগুলো (সূরা বাকারা : ২৩৬-২৩৭, সূরা নিসা : ৪, ২৪ ও ২৫) মনে খুব দাগ কাটে এবং নিজের ভেতরে এক ধরনের অস্থিরতা ও অনুশোচনা শুরু হয়।

কারণ বিয়ের সময় দেনমোহরের ব্যাপারে আমার বা আমার স্বামীর কোনো ধারণাই ছিল না। আমাদের বিয়ে হয়েছে প্রায় ১০ বছর হতে চলল এবং ২ লক্ষ ১ টাকা মোহরানা ধার্য করা হয়েছিল। যারা বিয়ে পড়ান তারাও দেনমোহর আদায়ের গুরুত্ব বিষয়ে কিছুই বলেন নি।

মর্মবাণী পড়ার পর আমি আমার স্বামীকে

আয়াতগুলো পড়ে শোনাই এবং বোঝাতে থাকি-যেহেতু তিনি দিতে সক্ষম, দীর্ঘদিন পর হলেও তার দেনমোহর আদায় করা উচিত। কারণ স্বয়ং স্রষ্টা নারী-পুরুষের সম্পর্কে বিয়ের মাধ্যমে বৈধ করেছেন এবং একে পবিত্র ও আইনসম্মত করার জন্যে দেনমোহর আদায় করাটাকে ফরজ করেছেন।

আমার স্বামী হেসে বিষয়টিকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলেন বার বার। তখন আমি তাকে বললাম, দেনমোহর জীবন কাছের স্বামীর এক ধরনের ঋণ এবং খুশিমনে অন্তর থেকে মাফ না করলে মাফ হয় না। তাছাড়া আমি যে ঘর-সংসার করছি, বাচ্চাদের মানুষ করছি এর জন্যে কোনো বেতন বোনাস ইনক্রিমেন্ট কিছুই তো পাই না। বিষয়টিকে ঋণ আদায় হিসেবে না দেখে অন্যভাবে দেখ। হয়তো এই কারণেও তুমি আত্মোত্তরে আটকা পড়ে যেতে পারো। মনে মনে ঠিক করলাম, এতদিন পর মাফ করার প্রশ্নই আসে না। তারপরও যদি অনুরোধ করে, অর্ধেক মাফ করে দেবো। বাকি অর্ধেকের ১০ ভাগের একভাগ ফাউন্ডেশনে দানের নিয়ত করলাম।

এর মধ্যে হঠাৎ করে আমার স্বামীর নামে তার অফিসে লাখখানেক টাকার একটা চেক জমা হয়। এর অল্প কিছুদিন পর আমাকে অবাক করে দিয়ে

মোহরানার সম্পূর্ণ টাকাটা তিনি আমাকে নগদ দিয়ে দেন। আর আমিও স্রষ্টার কাছে শুকরিয়া প্রকাশ করে দেনমোহরের টাকার চার ভাগের একভাগ ফাউন্ডেশনে দান করে দেই।

গুরুজী, আমাদের দেশে বিয়েতে অভিভাবকরা দেনমোহরের ব্যাপারে ছেলেদের কোনো জোর দেন না। একইভাবে কন্যাপক্ষের অভিভাবকরাও নিজেদের স্ট্যাটাস বজায় রাখার জন্যে বা অন্যদের কাছে বলে বেড়ানোর জন্যে পাত্রপক্ষের সাধ্যের অতিরিক্ত দেনমোহর ধার্য করেন। অথচ এটা আদায় করা নিয়ে কারো কোনো সচেতনতা নেই।

আমি ব্যক্তিগতভাবেই অনেক দম্পতিকে দেখেছি, যাদের বিয়ের ২০/২৫ বছর পার হলেও দেনমোহর শোধ হয় নি। শোধ করা যে জরুরি তা-ও তারা জানেন না। আবার অনেক স্ত্রী আহ্নে যারা স্বামীর চাপচাপিতে মুখে মাফ করেছেন কিন্তু অন্তর থেকে মাফ করেন নি, অন্তরে ক্ষোভ-কষ্ট পুষেই রেখেছেন।

গুরুজী, দোয়া করবেন যেন নিয়মিত মর্মবাণী পাঠ করার মধ্য দিয়ে সর্বোচ্চ উপকৃত ও আলোকিত হতে পারি এবং অন্যদেরও আলোকিত করতে পারি।

[নাম প্রকাশ করা হলো না]

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন



প্রশ্ন : আমি বুয়েট থেকে ২০০৭ সালে পাশ করি। তার পর থেকেই প্রায় আট বছর টেলিকমিউনিকেশন খাতে একটা কোম্পানিতে কাজ করছি। এখন আমার পরিবারের সবাই চাচ্ছেন, আমি যেন উন্নত কোনো দেশে ইমিগ্রেশনের চেষ্টা করি। বিশেষ করে আমার বড় ভাই, যিনি তিন বছর যাবৎ কানাডায় আছেন। তিনি আমাকে প্রায় দেড় বছর ধরে বলছেন, কানাডাতে ইমিগ্রেশনের চেষ্টা করতে। আমি তার সাথে কোনো তর্কে না গিয়ে এড়িয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নিই নি বলে তার সাথে আমার একরকম মনোমালিন্যও হয়েছে। আমার দুবোনও আমাকে বলছেন যেন আমি ভবিষ্যতের জন্যে অন্তত কিছু ব্যাক-আপ প্ল্যান রাখি।

এখন কথা হলো, আমি ফাউন্ডেশনের কাজ ও প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের সুযোগ এবং একাত্মতার কথা চিন্তা করে এ ব্যাপারে মানসিক সায় পাচ্ছি না। কিন্তু তারা তাদের কথায় বেশ কিছু যুক্তি তুলে ধরছেন, যা আমি আপনাকে বিশদভাবে লিখছি—

প্রথমত, টেলিকমিউনিকেশন এখন একটা স্যাচুরেটেড খাত। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই ইন্ডাস্ট্রির অধিকাংশ খাতেই ক্যারিয়ার উন্নয়নের সুযোগ একদমই কমে যাবে। এমনকি বড় বড় কোম্পানিগুলো অপারেটিং খরচ কমানোর জন্যে সুযোগসুবিধা হ্রাস করা সহ কর্মী ছাঁটাই ও অন্যান্য ব্যয় সংকোচনমূলক উদ্যোগ নেবে।

তাই এ ধরনের কোনো খাতই ক্যারিয়ারের জন্যে খুব সুবিধাজনক অবস্থায় থাকবে না। আমার বয়স ৩২ বছর, আমি যদি এখন সুযোগ তৈরি করে না রাখি এবং দু-তিন বছর পর গিয়ে যদি উপলব্ধি হয়, তখন আর ভালো দেশগুলোতে যাওয়ার সুযোগ থাকবে না।

দ্বিতীয়ত, ঢাকায় যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে নাগরিক সুযোগসুবিধা সেই হারে বাড়ছে না। এত ছোট একটা শহরে এত লোকের নাগরিক সুবিধার ব্যবস্থা করা স্বাভাবিক কারণেই সম্ভব হবে না। যেসব দেশে উন্নত নাগরিক সুযোগসুবিধা রয়েছে, সেখানে যদি যাওয়ার যোগ্যতা থাকার পরও না যাই, তাহলে সেটা নিরুদ্ভিতা ছাড়া আর কিছু না। আমার পরিবারের সবার যুক্তি অনেকটা এরকম যে, আমি খাওয়ার টাকা থাকার পরও ইচ্ছা করে না খেয়ে থাকছি। যখন উপলব্ধি হবে তখন দেরি হয়ে যাবে।

তৃতীয়ত, নিজের বিনিয়োগ নিয়ে সঠিকভাবে চিন্তা করাটাও স্মার্টনেস। তাই সঞ্চয়পত্র, জমি কেনা ও অন্যান্য বিনিয়োগের মতো করে হলেও ইমিগ্রেশনের ব্যবস্থা করে রাখার মধ্যে কোনো ক্ষতি নেই। আমাকে যা বিনিয়োগ করতে হচ্ছে, তা হলো ছয়-সাত লাখ টাকা এবং চার-পাঁচ বছর সময়। এরপর তো চাইলে আমি চলে আসতে পারি। তাহলে আমি কেন করব না?

চতুর্থত, যদি নিজের জন্যে যেতে না চাই, অন্তত সন্তানদের জন্যে হলেও যেন যাই। হয়তো এখনো কিছু নাগরিক সুবিধা পাচ্ছি কিন্তু সন্তানদের জন্যে তা-ও নিশ্চিত করতে পারব না। যেমন : খেলার মাঠ, ফরমালিন-মুক্ত খাবার, নির্ভেজাল দুধ, ভালো স্কুলে পড়ার সুযোগ, বিশ্বাস করার মতো চিকিৎসক, ভেজালহীন ওষুধ ইত্যাদি।

তাই আমার যদি যেতে ইচ্ছা না হয় তাহলে অন্তত চার/ পাঁচ বছর বিদেশে থেকে পাসপোর্টটা এনে সন্তানদের হাতে যেন দেই। তাদের জন্যে সঞ্চয় হিসেবে আমি এই সুযোগ যেন তৈরি করে রাখি। আমি নিজের ইচ্ছায় দেশে থেকেছি কিন্তু তারা চাইলে এটা ব্যবহার করতে পারে। বিদেশে যেতে পারে।

এই ইমিগ্রেশন নিয়ে তাদের কথার বিপক্ষে আমার নিজের কিছু যুক্তি রয়েছে। যেমন, আমি যেখানেই যাই, কেউ তো আমার জন্যে জব তৈরি করে রাখে নি। তাছাড়া আমি তো সেখানে প্রথম শ্রেণির নাগরিক নই। কিন্তু আমি একবার যদি চলে যাই তাহলে আর ফিরে আসা হবে না।

কারণ আরামবলয়ে একবার ঢুকে গেলে কেউ আর চ্যালেঞ্জ নিতে চায় না। সর্বোপরি আমি দেশে ফাউন্ডেশনের কাজের সাথে সংযুক্ত থাকতে পারি, প্রোগ্রামগুলোতে অংশগ্রহণ করতে পারি। এ আনন্দ তো ওখানে কোনোভাবেই পাব না।

আবার নিজের ভেতরে একটা ভিন্নমতও মাঝে মাঝে উঁকি দেয়। গত ১৪ মাস চাকরিসূত্রে আমি যখন দেশের বাইরে ছিলাম, তখন মাটির ব্যাংকে দানসহ ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন সেবামূলক ক্ষেত্রে সাবলীলভাবে দান করতে পেরেছি। কিন্তু দেশে ফেরার পর এখনকার উপার্জিত অর্থে আমার পক্ষে ঐ পরিমাণ দান চালিয়ে যাওয়া যথেষ্ট কষ্টসাধ্য।

আমি যদি একটা ভালো বেতনে কাজ করি, তাহলে একদিক থেকে তো ফাউন্ডেশনের একটা উপকার হচ্ছে। কারণ শারীরিক পরিশ্রম করার সুযোগ অনেকের আছে। কিন্তু এতটা অর্থ উপার্জনের সুযোগ হয়তো সবার নেই। সক্ষে তো অর্থ ও পরিশ্রম দুটোরই দরকার আছে।

এই সমস্ত যুক্তি নিয়ে অবশ্য পরিবার-পরিজনদের সাথে আমি কোনো তর্কে যাই না। শুধু হাসি এবং এড়িয়ে যাই। কিন্তু আমি নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কিছু ঠিক করতে পারছি না। আগামী পাঁচ/ দশ বছর পর ঠিক কী কাজ করব, বুঝতে পারছি না। কোম্পানির অবস্থা যা দেখতে পাচ্ছি, তাতে আর দুবছরের বেশি এখানে ক্যারিয়ার নিয়ে বিশেষ প্রত্যাশা নেই।

অন্যদিকে প্রায় যেখানেই যাচ্ছি সবার মুখে একই কথা শুনে একটু কনফিউজড হয়ে গেছি। কারণ যারা বলছেন তাদের নির্দেশনা অনুসরণ করেই আমি পেশাগত জীবনে কিছুটা হলেও সাফল্য পেয়েছি। আর পরিবারের কথা নাই-বা বললাম।

উপরন্তু আমার বস আমাকে বলেছেন, আমার আট বছরের চাকরি জীবনে আমি যে কয়েকজন মানুষকে কিছুটা হলেও অনুসরণ করেছি, তাদের দিকে একটু তাকাতে যে, তারা এখন কে কী করছেন।

আমিও চিন্তা করে দেখলাম, তাদের একজন কানাডাতে ইমিগ্রেশন করেছেন, একজন আফ্রিকাতে কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করছেন, একজন নিজের কোম্পানি করেছেন, আরেকজন বাবার ব্যবসায় কাজ করছেন। বস আরো বললেন, অধিকাংশ মানুষই যখন কোনো একটা বিষয়ে একমত হয়, সেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত হয়। বাকিটা আমার ইচ্ছা।

গুরুজী, তাই সবকিছু চিন্তা করে কিছুটা অস্থির হয়ে আপনাকে লিখছি। আপনি সবসময় আমাদেরকে বলেন, একটা স্বপ্ন থাকতে হবে, একটা লক্ষ্য স্থির করতে হবে।

এ অবস্থায় একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট হিসেবে আমার ঠিক কী দৃষ্টিভঙ্গি নেয়া উচিত এবং কীভাবে লক্ষ্য স্থির করতে হবে, সে ব্যাপারে আপনার দিক-নির্দেশনা আশা করছি। অনুগ্রহ করে আমার ভুলগুলো শুধরে দেবেন।

উত্তর : চমৎকার প্রশ্ন। অধিকাংশ তরুণ-তরুণী, মোটামুটিভাবে যাদের বয়স এখন ২৮-৩৫ অর্থাৎ যারা ক্যারিয়ারের প্রাথমিক পর্যায়ে আছেন, তাদের একটি সামগ্রিক চিত্র এ প্রশ্নের মধ্যে ফুটে উঠেছে। বিশেষত যারা বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন। প্রশ্নগুলো যতই জটিল মনে হোক, একটু চিন্তা করলেই কিন্তু উত্তরগুলো খুব সহজ।

প্রথমত, ব্যাংক থেকে শুরু করে মাল্টিন্যাশনাল প্রতিষ্ঠান যত আছে, তাদের লক্ষ্যই হচ্ছে একজন কর্মী তরুণ/ তরুণীকে নিয়োগ দেয়া এবং তাকে দুজনের বেতন দিয়ে চার জনের কাজ করানো। এ প্রতিষ্ঠানগুলো যতজন তরুণ-তরুণীকে নিয়োগ দেয়, তার একটা বড় অংশকে ১০ বছরের মধ্যে নানাভাবে ছাঁটাই করে ফেলে। বড়জোর ৫% কোনোরকমে টিকে যায়।

আবার ১০ বছর কাজ করার পর চাইলে যে একজন ওখান থেকে নিজেই বেরিয়ে আসবে তা-ও পারা যায় না। কারণ, তারা বেতন পাচ্ছেন দুজনের। অতএব তাদের জীবনযাত্রার ব্যয় একসময় এমন হয়ে যায় যে, ইচ্ছা করলেও তিনি আর সেটা কমাতে পারেন না। আর ততদিনে ঘাড়ো ব্যথা, কাঁধে ব্যথা, কোমরে ব্যথা, মাথাব্যথা এসব তো আছেই। সাথে আছে ফাইভ-স্টার হাসপাতালে এসব রোগের চিকিৎসা-ব্যয়।

আর মাল্টিন্যাশনাল প্রতিষ্ঠানগুলোও দেখে যে, মোটামুটি বছর দেশের কাজ করার পর সে যে পরিশ্রম করছে তা চার জনের পরিশ্রম আর হচ্ছে না। তাই কর্তৃপক্ষ আবার নতুন করে তাদেরই নিয়োগ দেয় যারা চার জনের পরিশ্রম করতে সক্ষম। পুরনোদের মধ্যে তখন টিকে থাকতে পারে কেবল তারাই, ওপর মহলের বড়কর্তাদের সাথে যোগাযোগটা যাদের ভালো। কিন্তু সবার পক্ষে তো সেটা সম্ভব হয় না, সবাই তা পারেও না।

দ্বিতীয়ত, বিদেশে যাওয়া বা ইমিগ্রেশন প্রসঙ্গ। আমাদের দেশের পদস্থ একজন সরকারি কর্মকর্তার কথা জানি, যিনি আমেরিকায় গেছেন অনেক বছর আগে। তখন আজকের মতো ডিভি লটারি ছিল না, কিন্তু এরকমই কিছু একটা মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম ছিল। তো সেভাবে তিনি মনের আনন্দে চলে গেলেন আমেরিকাতে। তারপর চাকরি না পেয়ে ওখানকার একটি পেট্রোল পাম্প ফিলারের কাজ নিয়েছেন। আসলে আমরা এখন থেকে বিদেশটাকে স্বর্গ মনে করি। তারপর ওখানে গিয়ে যখন সব বুঝতে পারি ততদিনে আর দেশে ফেরার কোনো পথ থাকে না।

তৃতীয়ত, আপনি কী উদ্দেশ্যে বিদেশে যাবেন সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যারা ওখানকার ভালো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা/ গবেষণা/ শিক্ষকতা করার কিংবা ভালো কিছু করার যোগ্যতা নিয়ে যান সেটা আলাদা বিষয়।

কিন্তু যোগ্যতা ছাড়া ভালো কাজ পাওয়াটা খুব কঠিন। কারণ ওখানে প্রতিযোগিতা আরো বেশি। তাই অধিকাংশই ওসব দেশে গিয়ে অড জব করেন। তাই আপনি কী জন্যে যাবেন, কারণটা আপনার কাছে সুস্পষ্ট থাকতে হবে।

আর বিদেশে আপনি নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। এ ব্যাপারে কোনো সংশয় রাখবেন না। আবার, আপনি যদি মানুষকে আলোকিত করার জন্যে কোথাও যান, সেখানে আপনাকে প্রথমে দ্বিতীয় শ্রেণির বলে গণ্য করবে। কিন্তু যখন প্রথম শ্রেণির



উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

লোকেরা আপনার দ্বারা আলোকিত হওয়া শুরু করবে, তখন আপনি ওদের চেয়েও বেশি সম্মানিত হবেন। কারণ গুণ ও জ্ঞানের কদর সর্বত্র।

চতুর্থত, আপনি বলেছেন, ১৪ মাস যখন দেশের বাইরে ছিলেন তখন আপনি সাবলীলভাবে দান করতে পেরেছেন, সে পরিমাণ দান এখন চালিয়ে যাওয়া কষ্টসাধ্য।

আবার এটাও সত্যি যে, আপনি বিদেশে থেকে একা অনেক দিচ্ছেন কিন্তু দেশে যিনি এতটা দিতে পারছেন না, তিনি হয়তো চারপাশের আরো ২০ জনকে দানে উদ্বুদ্ধ করছেন এবং আপনার চেয়ে বেশি দান সংগ্রহ করছেন। তিনি ২০ জনকে সৎকর্ম সম্পৃক্ত ও উদ্বুদ্ধ করলেন, এর গুরুত্ব কি কম? টাকাটা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মানুষ। শুধু টাকা দিয়ে কাজ হয় না, যদি মানুষ তৈরি না হয়।

টাকার চেয়ে মানুষ তৈরি হওয়াটাকে আমরা তাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। ফাউন্ডেশনে অনেক অনুদান দেয়ার চেয়ে আপনি প্রতি মাসে হয়তো ১০ টাকা দান করলেন। কিন্তু আপনি যদি নিজেকে একজন আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন, তাহলে তার গুরুত্ব ও প্রভাব সার্বিকভাবে অনেক অনেক বেশি। স্রষ্টার কাছেও তখন আপনি আরো বেশি প্রিয় হবেন।

শুধু টাকা দিয়ে নিজেকে আলোকিত করা যায় না। অবশ্যই দানটা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দানের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে চেতনার রঙে নিজেকে রাঙানো।

পঞ্চমত, সঞ্চয় হিসেবে আপনি সন্তানদের জন্যে বিদেশি পাসপোর্ট দিতে চান। কিন্তু বাস্তব চিত্রটা কী? বহু বাঙালি সন্তান যারা বিদেশে জন্মগ্রহণ করেছে বা শিশুকালে যারা বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে, অধিকাংশের কী অবস্থা? তাদের নিজেদের কোনো পরিচয় নেই। না আছে তার কোনো সাংস্কৃতিক পরিচয়, না আছে চেতনাগত পরিচয়।

মনে রাখবেন, আপনার সন্তানকে আলোকিত করার সবচেয়ে বড় নিশ্চয়তা আপনি। আপনি যদি আপনার সন্তানকে যোগ্য করে তুলতে চান তবে দেশে থেকেও তা সম্ভব। এমন উদাহরণ আমাদের চারপাশে অসংখ্য।

আর বিদেশে যারা যাচ্ছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের ছেলেমেয়েরা অন্যান্য সুযোগসুবিধার চেয়ে সেখানকার বৈষয়িক আরামের সুযোগ গ্রহণ করছে, ফাস্টফুড খেয়ে মোটা হচ্ছে। সেখানকার ভালোগুলোর চেয়ে অপসংস্কৃতি যা আছে, সেটাই তারা গ্রহণ করে বেশি। আপনার সন্তানও যদি বিদেশি পাসপোর্ট নিয়ে ওই অপসংস্কৃতিতে হারিয়ে যায়, ড্রাগনে হারিয়ে যায়, তাহলে আপনি সন্তানের উপকার করলেন, না ক্ষতি করলেন?

আসলে এই ইমিগ্রেশন আর বিদেশি পাসপোর্ট মানেই আপনার সন্তানের জীবনের নিরাপত্তা বা নিশ্চয়তা নয়। কারণ, যোগ্য না হলে সে বিদেশে গিয়ে ডিশ ওয়াশ করবে। তাই সন্তানকে আলোকিত মানুষ করে গড়ে তোলার চেষ্টাই আপনার কর্তব্য, বিদেশি পাসপোর্ট দেয়া নয়। আর তার আগে প্রয়োজন নিজে আলোকিত হওয়া।

আপনি বলছেন, দেশে ফরমালিন-মুক্ত খাবার ও নির্ভেজাল দুধ নেই। বিদেশের খাবার নির্ভেজাল এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। বরং ওখানকার ফুড ইন্ডাস্ট্রিগুলো এতই ক্ষমতাধর যে, তাদের উৎপাদিত

ও বাজারজাতকৃত খাবারে ভেজাল যে ধরতে যাবে, তার বিপদ আছে। কারণ খাদ্য ব্যবসায়ীরা ওখানে অনেক বেশি প্রতাপশালী এবং তাদের খাদ্যে ভেজাল আরো সুস্বাদু, আরো জটিল, আরো ব্যাপক।

তাই ফরমালিন-মুক্ত খাবার, নির্ভেজাল দুধ আর বিশ্বাস করার মতো চিকিৎসক ও ভেজালহীন ওষুধ-এসব বিষয়ে আমরা বিদেশ সম্পর্কে যা ভাবি তা পুরোপুরি সত্য নয়। অন্য দেশের কথা বাদ দিন, খোদ আমেরিকাতে মৃত্যুর তৃতীয় কারণ হচ্ছে ডাক্তার ও ভুল চিকিৎসা।

এটা আমার কথা না, জার্নাল অব আমেরিকান মেডিকেল এসোসিয়েশন-এ (২৮ জুলাই, ২০০০) প্রকাশিত একটি রিপোর্টে উল্লিখিত পরিসংখ্যান। যুক্তরাষ্ট্রের প্রবীণ চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও জঙ্গ হপকিন্স মেডিকেল স্কুলের জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. বারবারা স্টারফিন্ড তার সুদীর্ঘ গবেষণার ফলাফল হিসেবে রিপোর্টটি প্রকাশ করেন। তাতে বলা হয়েছে, হৃদরোগ ও ক্যান্সারের পর যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যুর তৃতীয় কারণ ডাক্তারদের ভুল ও অপ্রয়োজনীয় চিকিৎসা এবং প্রতিবছর গড়ে দুই লক্ষ ২৫ হাজার মানুষ শুধু এ কারণেই মৃত্যুর মুখোমুখি হয় ওখানে। যার মধ্যে ১২ হাজারই মারা যায় অপ্রয়োজনীয় সার্জারির কারণে।

সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান আরো ভয়াবহ। ২০ নভেম্বর, ২০১৪-তে হাফিংটন পোস্ট-এ প্রকাশিত একটি চিকিৎসা নিবন্ধে ডিউক ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ইমেরিটাস অ্যালেন ফ্রান্সিস জানিয়েছেন, এ সংখ্যা এখন বছরে চার লক্ষ ৪০ হাজার। তার মতে, 'এ-তো কেবল হাসপাতালে-ভর্তি রোগীদের পরিসংখ্যান, এর বাইরে হাসপাতালের বহির্বিভাগে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীদের কী দশা কে জানে!'

এই হলো 'বিশ্বাস করার মতো চিকিৎসকদের' অবস্থা! বিশ্বাস করার মতো চিকিৎসক যদি দু-চারজন থাকেন তবে আমাদের দেশেই আছে। পাঁচাতো বিশ্বাস করার মতো চিকিৎসক নেই, ওখানে প্রায় সবই চিকিৎসাব্যবসা। কোর্সেই তো আমরা বলি-শতকরা ৯৫টি সিজারিয়ান ওখানে হয় ক্লিনিকের বিল বাড়ানোর উদ্দেশ্যে। এটাও আমেরিকান মেডিকেল এসোসিয়েশনেরই গবেষণালব্ধ তথ্য।

হাঁ, ওখানে পণ্যের প্রাচুর্য আছে। কারণ পণ্যের উৎপাদন ওখানে অনেক বেশি। এবং প্রযুক্তি ওখানে অনেক অগ্রসর। কিন্তু প্রশান্তি কি আছে? যদি থাকত তাহলে এত অস্থিরতা কেন? এত মানসিক রোগী, এত চাঁদাবাজি কেন? নিউইয়র্কে কেউ দোকান করতে পারে না মাকিয়াদের পয়সা না দিয়ে।

ওখানে বিভিন্ন রাস্তা আছে, সেখানে পুলিশ বলেই দেয় যে, পাঁচ/দশ ডলার সাথে রাখতে, কারণ কোনো ডলার না পেলে সন্ত্রাসীরা ছুরি বসিয়ে দিতে পারে, আর ওই মামলা পুলিশ নেয় না। অতএব এ ভুল ধারণায় ভুগবেন না যে, ওখানে সবাই ভালো। সবকিছুতে ব্যবসাটাই হচ্ছে ওদের আসল কথা।

এখন কথা হলো, একজন গ্রাজুয়েট হিসেবে আপনি যদি কল্যাণমূলক কাজের সাথে জড়িত হতে পারেন, সেটাই আপনার জন্যে সবচেয়ে ভালো। আর বিদেশে স্থায়ী হলে পণ্যের যে বলয়, সোজা কথায় পণ্যদাসত্ব, তা থেকে বেরিয়ে আসা খুব কঠিন।

পণ্যের তো একটা জৌলুস আছে, সেটা আপনাকে কিছুদিন ভুলিয়ে রাখবে, তারপর যখন দেশে ফিরতে চাইবেন তখন ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও পারবেন না। কারণ, দেশে ফিরে কী করবেন, এ

অনিশ্চয়তাই আপনাকে সিদ্ধান্তহীন করে তুলবে।

আগেই বলেছি, যদি বিদেশে যান এই মিশন নিয়ে যে, আমি ওখানে গিয়ে ভালো উপার্জন করব, সেখানকার মানুষকে আলোকিত করার জন্যে কাজ করব-তাহলে ভিন্ন কথা। এটা একটা চ্যালেঞ্জ।

বিদেশে গিয়েও মানুষকে আলোকিত করার কাজ-এর চেয়ে সাহসী উদ্যোগ আর কিছু হতে পারে না। আর যে সত্যিকারের সেবা দেয় সে কখনো দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক থাকে না। সে তখন প্রথম শ্রেণির নাগরিক হয়ে যায়।

আর সবচেয়ে বড় সেবা হচ্ছে, একজন মানুষকে আলোকিত করা। তার দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো এবং চেতনার বিভ্রান্তি দূর করার চেষ্টা। এই সেবা যে দিতে পারবে, পৃথিবীর যেখানেই যাক সে সম্মানিত হবে। সেজন্যে আপনাকেও আলোকিত হতে হবে। চেতনাগত দিক থেকে এগিয়ে যেতে হবে। সঙ্গে একাত্ম হলেই কেবল তা সম্ভব। যেখানেই আপনি থাকুন না কেন, এ একাত্মতা চির অটুট থাকতে পারে যদি আপনি আন্তরিক হন।

আপনি যেহেতু মাল্টিন্যাশনাল প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন, মনে রাখবেন, সর্বোচ্চ ১০ বছর। এর আগেই অর্থাৎ পাঁচ/সাত বছরের মাথায় যদি অন্য প্রতিষ্ঠানে চলে যেতে পারেন তাহলে খুব ভালো। চাকরি যারা করেন তারা যত প্রতিষ্ঠান বদলাতে পারবেন পেশাগত জীবনে তত ওপরে যেতে পারবেন। এক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি হবে একটাই-'আমি আমার শ্রম বিক্রি করছি, যেখানে বেশি পয়সা ও সুযোগসুবিধা দেবে সেখানে কাজ করব।'

এ-তো গেল ক্যারিয়ারের একটা দিক। তবে এ ব্যাপারে আমার পরামর্শ হলো, যত ভালো প্রতিষ্ঠানই হোক চাকরি হলো চাকরিই। তাই যদি উদ্যোক্তা হতে পারেন সেটা সবচেয়ে ভালো। একজন উদ্যোক্তা হলে আপনার মেধা, শ্রম ও প্রজ্ঞার সর্বোচ্চ ব্যবহার করে আপনি বহুদূর যেতে পারবেন।

আর তা না হলে মিশনারি হবেন। মানুষের জন্যে কাজ করবেন। সেবা, সৎকর্ম ও মানুষকে আলোকিত করার কাজে আপনার পুরোটা সময় দেবেন। তাহলে প্রাকৃতিক নিয়মেই আপনি ভালো থাকবেন। অভাবমুক্ত থাকবেন। শারীরিক মানসিক দিক থেকে সুস্থ থাকবেন।

অতএব, এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিন। কোনো ভুল বা অলীক ধারণার বশবর্তী না হয়ে জীবনের লক্ষ্য ঠিক করুন। সন্তানের নিরাপত্তা নিয়ে কখনো দৃষ্টিভ্রান্তি করবেন না। কারণ আমরা কেউই জানি না আগামীকাল আমাদের জীবনে আসবে কিনা। অতএব আমরা যতদিন বেঁচে থাকি যেন কল্যাণের পথে চলতে পারি এবং কখনো স্রোতে যেন গা ভাসিয়ে না দেই। যা সত্য বলে জানব, সবসময় সেই সত্যের সাথে যেন থাকতে পারি, যেখানেই আমরা থাকি না কেন।

এ মাসের অটোসাজেশন

শুধু ভোগবিলাসের জন্যে নয়,
মানুষকে কিছু দেয়ার জন্যে
আমি কাজ করব।
আমি অমর হবো।

নিয়মিত রক্তদানের অনুভূতি

দেড় দশক ধরে নিরাপদ রক্তের চাহিদা পূরণে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে কোয়ান্টাম স্বৈচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম। রক্তদান ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন অশেষ পুণ্যের কাজ, তেমনি রক্তদাতার মনোদৈহিক সুস্থতার ক্ষেত্রেও এর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। দেশে মোট রক্তচাহিদার ১৬%-ই এখন মেটাচ্ছে কোয়ান্টাম। মুমূর্ষু মানুষের প্রাণ বাঁচাতে সারা বছর এখন থেকে দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা সেবা নেয়ার সুযোগ রয়েছে সবার জন্যে। দুর্গত মানুষের কল্যাণে এ পর্যন্ত সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে সাত লক্ষ ১৫ হাজার ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান। আর এ রক্ত যারা দান করছেন তাদের নিয়ে গড়ে উঠেছে আড়াই লক্ষ রক্তদাতার একটি সমৃদ্ধ ডোনার পুল। এমনই কয়েকজন রক্তদাতা জানিয়েছেন তাদের অনুভূতি—

রক্তদান স্রষ্টার সেবা করার অনন্য প্ল্যাটফর্ম

তিমথী হালদার

রক্তদানের ব্যাপারে আমি তরুণ বয়স থেকেই উৎসাহী ছিলাম। তবে রক্তের গ্রুপ নেগেটিভ হওয়ায় কিছু সমস্যায় পড়তে হতো। ব্লাড ল্যাবগুলো রক্ত নিতে চাইত না। নিয়মিত রক্তদান করার সৌভাগ্য হবে



কিনা এরকম একটা অনিশ্চয়তা ছিল। এর মাঝে কোয়ান্টাম ল্যাবের নাম শুনে যোগাযোগ করলাম। এখানকার কর্মীদের আন্তরিক ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করল। সেই ২০০১ সাল থেকে আজও নিয়মিত কোয়ান্টামে রক্তদান করছি।

রক্তদান করার পর ল্যাব থেকে পাঠানো রিপোর্ট আমার জন্যে এক বড় প্রাপ্তি। প্রাণঘাতী রোগের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকার নিশ্চয়তা পাই এই রিপোর্ট দেখেই।

স্রষ্টার সেবা করার জন্যে একটি প্ল্যাটফর্ম লাগে। আমি মনে করি, কোয়ান্টাম ল্যাব হলো সেই প্ল্যাটফর্ম। আজ সারাদেশে সবাই জানে কোয়ান্টাম ল্যাবের রক্ত বিশুদ্ধ ও নিরাপদ। এই অর্জনের অংশ হতে পেরে আমি গর্বিত।

[তিমথী হালদার, জিএম, ফিন্যান্স এন্ড এডমিন, টিম ক্রাউলি বাংলাদেশ লিমিটেড]

পরিচিত সবাইকে রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করি

মো. সাগর

রক্তদানের গুরুত্ব উপলব্ধি করার পর থেকে নিজে রক্ত দিচ্ছি ও আত্মীয় সহকর্মীদের রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করছি। পরিচিত কাউকে রক্তদানের ব্যাপারে উৎসাহিত করতে গেলে তাদের প্রথম কথাই হয় ‘আমার তো ভাই রক্ত নাই’। তারপর যখন তাদের বুঝিয়ে বলি যে, তার এক ব্যাগ রক্তে বাঁচতে পারে চারটি প্রাণ, তখন তারা আগ্রহী হয়।



একবার একজনকে কোনোভাবেই রক্তদানে রাজি করতে পারলাম না। তবে ল্যাবে আসতে তিনি রাজি হলেন। ল্যাবের কর্মীদের আন্তরিক ব্যবহার ও পরিবেশ দেখে তিনি রক্ত দিলেন। তারপর থেকে খাবারে তার রুচি ও শারীরিক সুস্থতা বেড়েছে।

[মো. সাগর, ব্যবসায়ী]

আপনিও বাঁচাতে পারেন চারটি প্রাণ যদি—

- ◆ আপনার বয়স হয় ১৮ থেকে ৬০ বছর
- ◆ ওজন হয় কমপক্ষে ৪৫ কেজি
- ◆ শারীরিকভাবে যদি হন সুস্থ-সবল

১৬ বছর ধরে নিয়মিত রক্তদান করছি

অনিবার্ণ হক

ল্যাব প্রতিষ্ঠার আগের ঘটনা। ওয়ার্কশপে গুরুজী একটি গল্প বললেন— এক



দম্পতির দুই মেয়েই থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত। এক ঈদের আগের রাতে দুজনই অসুস্থ হয়ে পড়ল, দুজনকেই রক্ত দিতে হবে। বাবা-মা অনেক খোঁজাখুঁজি করে এক ব্যাগ রক্ত জোগাড় করতে পারলেন। কিন্তু কোন বাচ্চাকে দেবেন? বড় মেয়েটি তখন বলল, ‘বাবা, আমি বড়, আমি ব্যথা সহ্য করতে পারব। ও তো ছোট! রক্তটা ওকে দাও।’ ছোট মেয়েটিকে রক্ত দেয়া হলো। ঈদের দিন ভোরবেলা বড় মেয়েটি মারা গেল।

গল্পটি আমাকে এতটা আলোড়িত করল যে, তারপর থেকে এই ১৫-১৬ বছর ধরে নিয়মিত রক্তদান করছি। যদি এতে মানুষের কোনো উপকার হয় তবে কারো কাছেই কোনোরকম প্রতিদানের প্রত্যাশা নেই আমার। স্বৈচ্ছা রক্তদান এমন এক সেবা যার প্রতিদান একমাত্র স্রষ্টাই দিতে পারেন।

[অনিবার্ণ হক, প্রকৌশলী]

রক্তদান করা প্রতিটি সুস্থ মানুষের দায়িত্ব

কৃত্তিকা আক্তার মোনালিসা

যখন একজন মানুষ শারীরিকভাবে সুস্থ-সবল থাকে, রক্তদান করা তার দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। আর্থিকভাবে যারা সচ্ছল তাদের সম্পদে যেমন অসচ্ছল মানুষের হক থাকে, আমি মনে করি, সুস্থ মানুষের রক্তে তেমনি অসুস্থ রোগগ্রস্ত মানুষের হক আছে। এই হক অবশ্যই পালন করতে হবে। যদি না করি, হয়তো অন্য কোনোভাবে সেই রক্ত দিতে হবে। তাই বয়স ১৮ হওয়ার পর থেকে আমি রক্ত দিচ্ছি। আমার বিশ্বাস এজেন্সি শারীরিকভাবে আমি সুস্থ আছি।



[কৃত্তিকা আক্তার মোনালিসা, ফিল্যান্স মেক-আপ আর্টিস্ট]

আমার পরিবারের সবাই এখন রক্তদাতা

নাহার নিগার

প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর থেকে নিয়মিত রক্ত দেয়ার চেষ্টা করি। আমাকে রক্ত দিতে দেখে আমার দুই শিশুপুত্র বলত, ‘মা, আমরাও রক্ত দেবো।’ আমার জন্যে আনন্দের বিষয় হলো তারাও এখন রক্তদাতা।



কয়েক বছর আগের একটি ঘটনা রক্তদানে আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। থ্যালাসেমিয়া-আক্রান্ত একটি শিশুর জন্যে রক্ত দেয়ার পর জানতে পারলাম, বেঁচে থাকার জন্যে প্রতি মাসে এই শিশুটির রক্তের প্রয়োজন হয়। তাই প্রতি মাসেই তাকে ল্যাবে এসে অপেক্ষা করতে হয় এক ব্যাগ রক্তের জন্যে। বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর যে সুযোগ কোয়ান্টাম আমাদের করে দিয়েছে, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ।

[নাহার নিগার, গৃহিণী]

যতদিন সুস্থ আছি রক্তদান করতে চাই

বিকাশ চন্দ্র রায়

রক্তদান যে কত বড় পুণ্যের কাজ তা বুঝলাম বছর কয়েক আগে। তখন ঢাকা শহরে সাক্ষ্য আইন জারি ছিল। হঠাৎ এক রাতে ল্যাব থেকে ফোন এলো— ক্যাসারে আক্রান্ত একটি শিশুর জন্যে জরুরি ভিত্তিতে রক্তের প্রয়োজন। যেহেতু আরেকজন মানুষের বিপদে সাহায্য করার নিয়তে যাচ্ছি, স্রষ্টার ওপর ভরসা করে রওনা হলো। অবাক হয়ে দেখলাম, পথে কেউ আটকাল না বা জিজ্ঞাসাবাদও করল না।



মুমূর্ষু মানুষের প্রাণরক্ষায় রক্তদান হলো সাত্বিক দান। যে দান দাতার হৃদয়ে অহম সৃষ্টি করে না। সনাতন ধর্মে এমন দানের ব্যাপারেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যতদিন সুস্থ আছি, নিয়মিত যেন রক্তদান করতে পারি সেই প্রার্থনাই করি।

[বিকাশ চন্দ্র রায় (বাঙ্গা), বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত]

ডাক্তাররা বিস্মিত হলেন!

শাহীদা রহমান



হঠাৎ করে আমার স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হাসপাতালে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ডাক্তাররা জানালেন, তার লিভারে সিস্ট হয়েছে। আরো বললেন, সিস্টের আকার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে যা খুবই

আশঙ্কাজনক। অপারেশনের জন্যে তারা তিন মাস পর হাসপাতালে যেতে বললেন।

স্বামীর সুস্থতার নিয়তে আমি নিয়মিত মাটির ব্যাংকে দান করতে শুরু করলাম। লামা হিলিংয়েও নাম দিলাম। তিন মাস পর আবার টেস্ট করানো হলো। দেখা গেল সিস্টের আকার তো বাড়েই নি বরং ছোট হয়ে অর্ধেক হয়ে গেছে!

ডাক্তাররা বিস্মিত হয়ে গেলেন। তারা বললেন, 'সিস্টের আকার কমে গেল কীভাবে? এটা তো অপারেশন ছাড়া কোনোভাবেই সম্ভব না।' আমার বিশ্বাস, সৎ দানের ফলেই স্রষ্টা আমাদের এই উপহার দিলেন।

[শাহীদা রহমান, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। ৩২৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

সুস্থ সন্তান লাভ করলাম

ডা. গাজী মো. সালাহুদ্দীন

আমার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা হওয়ার পর ডাক্তাররা বললেন, মায়ের ডায়াবেটিস থাকায় সন্তানের সুগার লেভেল কম থাকতে পারে।

সুস্থ সন্তান লাভের নিয়তে আমি প্রতিদিন দান করতে থাকি।

স্রষ্টার রহমতে পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। কিন্তু ডাক্তাররা জানালেন বাচ্চার দেহে গ্লুকোজ স্বাভাবিকের চেয়ে কম। তারা বেশ কিছু ওষুধ কিনতে দিলেন। তখন বেশ কষ্ট হচ্ছিল—আমার দান কি তবে বিফলে গেল? তিন দিন পর আবার টেস্ট করানো হলো। এবার ধরা পড়ল ক্লিনিকের গ্লুকোমিটার নষ্ট! বাচ্চা আসলে প্রথম দিন থেকেই সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল।

[ডা. গাজী মো. সালাহুদ্দীন। ১৯২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



মাটির ব্যাংকে দানের সাফল্য

কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক কার্যক্রম নিরন্তর ও বঞ্চিত মানুষের সেবায় নিয়মিত দানের চমৎকার এক সুযোগ। গত দেড় যুগে দানের স্বতঃস্ফূর্ত কল্যাণধারায় হাজারো দাতা লাভ করেছেন বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও আত্মিক প্রশান্তি। সৎদান স্রষ্টার পছন্দনীয় কাজ। এ বছর থেকে আমরা তাই দিন শুরু করেছি দানের মধ্য দিয়ে। পরম করণাময়ের করুণায় যা দাতার জীবনে নিশ্চিত করছে প্রশান্তি, রোগমুক্তি ও সাফল্য। তেমনই কয়েকজনের অনুভূতি এখানে তুলে ধরা হলো—

বিপদের বন্ধু মাটির ব্যাংক

এড. প্রিয়লাল সাহা

কিডনির সমস্যায় মা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আইসিইউ-তে ভর্তি করলাম। এক পর্যায়ে ডাক্তার বললেন, স্রষ্টার কাছে দোয়া করা ছাড়া আর পথ নেই।

তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিলাম, মা সুস্থ হলে ২০ হাজার টাকা মাটির ব্যাংকে দান করব। একটু পর সেই ডাক্তার এসে মা-কে ছয়টি ইঞ্জেকশন দিয়ে বললেন, 'যা করার করেছি, বাকিটা ওপরওয়ালার হাতে।' আধঘণ্টা পর মা ভালো বোধ করতে শুরু করলেন। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন আমার মা। মাটির ব্যাংক-কে এখন মনে হয় বিপদের বন্ধু।

[প্রিয়লাল সাহা, আইনজীবী। ১২৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



হারানো ব্যাগ ফিরে ফেললাম

কামরুন্নাহার

ট্রেনে করে যাচ্ছিলাম। এক স্টেশনে ট্রেন থামলে দেখি আমার ব্যাগটি নেই। একটু পর ট্রেন ছেড়ে দিল। জানালা দিয়ে দেখি চোরেরা ব্যাগটি ফেলে দিয়ে চলে যাচ্ছে। ব্যাগ উদ্ধার করে দেখা গেল, কোনো জিনিসই তারা নেয় নি!

সফরের আগে নিরাপদ যাত্রার নিয়তে সবসময় মাটির ব্যাংকে দান করি। আমার বিশ্বাস, এজন্যেই আল্লাহর রহমতে ব্যাগটি অক্ষত ফিরে পেলাম।

[কামরুন্নাহার, গৃহিণী। ৩৭৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



ডাক্তারের কাছে যাওয়ার আগে দান করি

দিলারা হোসেন

কিছুদিন আগে আমার ছেলের পেটে প্রচণ্ড ব্যথা হয়। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বললেন, সম্ভবত প্যানক্রিয়াসের ক্যান্সার। সাথে সাথেই মাটির ব্যাংকে দান করলাম। পরবর্তী টেস্টে নিশ্চিত হলো তেমন কিছু হয় নি।

দানের উপকার এর আগেও পেয়েছি। আমার স্বামীর ব্রেনে টিউমার আছে বলে ডাক্তাররা আশঙ্কা করছিলেন। তার নিরাময়ের নিয়তে মাটির ব্যাংকে ৩০ হাজার টাকা দান করলাম। এমআরআই করে দেখা গেল টিউমার আছে, তবে সেটা ব্রেনে নয় এবং তা নিরাময় সম্ভব।

যখনই ডাক্তারের কাছে যেতে হয়, মাটির ব্যাংকে দান করে তারপর যাই। দানের ব্যাপারে আত্মীয়স্বজনদেরও উদ্বুদ্ধ করি। আমি এ পর্যন্ত ২৫টি মাটির ব্যাংক বিতরণ করেছি।

[দিলারা হোসেন, গৃহিণী। ২৩২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



রিকশায় ককটেল পড়লেও আমি অক্ষত

সাকি মাহমুদ

গত বছর একদিন রিকশা করে কাজে যাচ্ছিলাম। তখন মাটির ব্যাংকে একবেলা দান করতাম। গুরুজীর নির্দেশ অনুযায়ী সেদিন দুই বেলা দান করেছিলাম। যা-হোক কিছুদূর এগোতেই

একটি ককটেল এসে পড়ল রিকশার কাছেই। ককটেলের আঘাতে চাকার অনেকগুলো স্পোক ছিঁড়ে গেল। কিন্তু আমি ও রিকশাচালক দুজনই সম্পূর্ণ অক্ষত ছিলাম! স্রষ্টার কাছে শুকরিয়া করলাম।

এ বছর হজে গিয়েও প্রতিদিন দান করেছি। এর সুফলও অনুভব করেছি প্রতিমুহূর্তে। ঘরের বাইরে থাকলেও নিয়মিত দান যেন মিস না হয় সেজন্যে মানিব্যাগের একটি পকেট মাটির ব্যাংকের জন্যে নির্দিষ্ট করেছি।

[সাকি মাহমুদ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর পদে কর্মরত। ১২৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



বেঁচে গেলাম নিশ্চিত দুর্ঘটনা থেকে

মো. আল-আমীন

বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে থাকি। একদিন মাঝরাত্তে ঘুম ভেঙে গেল। বেশ অস্থির লাগছিল। অস্থিরতা দূর করার জন্যে ভাবলাম মেডিটেশন করি। তাই বিছানা থেকে নেমে রুমের ফাঁকা একটা জায়গায় চলে গেলাম। মেডিটেশন শেষে চোখ মেলায় একটু পরেই সিলিং ফ্যানটা সশব্দে আমার বিছানার ওপর খুলে পড়ল। আমি যদি শুয়ে থাকতাম, ফ্যানটা পড়ত সোজা আমার মাথায়।

আরো একবার অনুভব করলাম স্রষ্টার দয়া ও

প্রতিশ্রুতি—‘দান অকল্যাণের ৭০টি দরজা বন্ধ করে।’ প্রতিদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে দান করি। ছুটিতে বাড়ি গেলে যে-কদিন ছুটি সে অনুযায়ী হিসাব করে আত্মগোষ্ঠী মাটির ব্যাংকে টাকা রাখি।

[মো. আল-আমীন, শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ৩৩৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



স্বৈচ্ছা রক্তদান ক্যাম্প মাসজুড়ে সংগ্রহ সহস্রাধিক ব্যাগ রক্ত



ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজে মোট সংগ্রহ ৩৪৪ ব্যাগ রক্ত

কোয়ান্টাম স্বৈচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের আয়োজনে অক্টোবর মাসজুড়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বেশ কিছু ব্লাড ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ১১ অক্টোবর ওয়ুথ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান এরিস্টোফার্মা লিমিটেড-এ একটি ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পটি উদ্বোধন করেন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান এম এ হাসান এবং লায়স ক্লাব অব ইন্টারন্যাশনাল-এর গভর্নর স্বদেশ রঞ্জন সাহা। দিনব্যাপী এ ক্যাম্পে রক্তদান করেন প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের ১৮১ জন কর্মী।

১৩ ও ১৪ অক্টোবর ব্লাড ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (আইইউবি)-এর নিজস্ব ক্যাম্পাসে। এতে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি (ডেজিগনেট) প্রফেসর মিলান প্যাগোন এবং সিনিয়র ম্যানেজার



রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান চেকপয়েন্ট সিস্টেম বাংলাদেশ লি.-এ অনুষ্ঠিত ব্লাড ক্যাম্পে সংগৃহীত হয় ৫৬ ব্যাগ রক্ত

অধ্যক্ষ মো. ওয়ালি উল্লাহ। কলেজের শিক্ষকমণ্ডলী ও শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে দিনব্যাপী এ ব্লাড ক্যাম্প থেকে মোট সংগৃহীত হয় ৩৪৪ ব্যাগ রক্ত।

শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে রাজধানীর দুটি মন্দিরে ব্লাড ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ১২ অক্টোবর স্বামীবাগস্থ লোকনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রম ও মন্দিরে অনুষ্ঠিত ক্যাম্পটি উদ্বোধন করেন মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি পঙ্কজ নাথ এমপি (বরিশাল-৪)।

পরবর্তীতে ২২ অক্টোবর ঢাকেশ্বরী মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় আরেকটি ব্লাড ক্যাম্প। প্রতি বছরের মতো এবারও ঢাকেশ্বরী মন্দির কর্তৃপক্ষ শারদীয় উৎসবে ব্লাড ক্যাম্প আয়োজনে সহযোগিতার জন্যে কোয়ান্টাম রক্তদান কার্যক্রমকে আমন্ত্রণ জানায়। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শারদীয় ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত দুটি ক্যাম্পেই প্রচুর জনসমাগম ঘটে।

রক্তদান সম্পর্কিত নানা তথ্য জানতে ক্যাম্পে ভিড় করেন অগ্রহীরা।

২১ অক্টোবর আদমজী ইপিজেড-এ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান চেকপয়েন্ট সিস্টেম বাংলাদেশ লি.-এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় আরেকটি ব্লাড ক্যাম্প। প্রতিষ্ঠানের এইচ আর ম্যানেজার আবু হাসনাত নিজে রক্তদানের মধ্য দিয়ে ক্যাম্পটি উদ্বোধন করেন। প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মীদের সহযোগিতায় ও

দুই দিনব্যাপী এ ক্যাম্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক মিলিয়ে ১৮৬ জন রক্তদান করেন। এছাড়াও ২১ জন আজীবন রক্তদাতাকে (ন্যূনতম তিন বার রক্তদানকারী) বিশেষ ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজে ব্লাড ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় ১৫ অক্টোবর। ক্যাম্পটি উদ্বোধন করেন লায়স ক্লাব অব ইন্টারন্যাশনাল-এর গভর্নর স্বদেশ রঞ্জন সাহা এবং কলেজের



ঢাকার স্বামীবাগে লোকনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রম ও মন্দিরে অনুষ্ঠিত ব্লাড ক্যাম্প উদ্বোধন করেন পঙ্কজ নাথ এমপি

আন্তরিক অংশগ্রহণে ৫৬ ব্যাগ রক্ত সংগ্রহ করা হয় এ ক্যাম্প থেকে।

এছাড়াও অক্টোবর মাসজুড়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আয়োজন করা হয় ব্লাড ক্যাম্প। ক্যাম্পগুলোতে রক্তদাতাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সংগৃহীত হয়েছে সহস্রাধিক ব্যাগ রক্ত।



আইইউবি-তে দুই দিনব্যাপী ব্লাড ক্যাম্পে ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট দেয়া হয় ২১ জন আজীবন রক্তদাতাকে



ওয়ুথ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান এরিস্টোফার্মা লিমিটেড-এ অনুষ্ঠিত ব্লাড ক্যাম্প থেকে সংগৃহীত হয় ১৮১ ব্যাগ রক্ত